হাসান আজিজুল হক

হাসান আজিজুল হকের বড় ভাই বর্ধমান শহরে চাচার কাছে থেকে স্কুলে পড়তেন। সেখান থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরতৎচন্দ্র ও অন্যান্য লেখকের বই আসত গ্রামের বাড়িতে। ভাইয়ের পাঠানো এসব বই পড়তেন তিনি এবং মামার বাড়ি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বিভিন্ন বইয়ের জন্য তল্লাশি চালাতেন। বই সংগ্রহ করে বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকতেন সবসময়। আর এভাবে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতেই লেখালেখি শুরু করেন এবং এদেশের একজন জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অসংখ্য উৎকৃষ্ট গল্পের সমারোহে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তিনি। অবিশ্রান্ত লিখে যাচ্ছেন নতুন নতুন গল্প। বিশ্ব ছোটগল্পের সাথে তুলনা করে বলা যায় বাংলা ছোটগল্পকে তিনি ইতিমধ্যেই একক চেষ্টায় তুলে দিয়েছেন অনন্য সাধারণ উচ্চতায়। শুধু সাহিত্য নয়, গণমানুষের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামেও তিনি বরাবর সোচ্চার।

১৯৩৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে হাসান আজিজুল হক জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় যবগ্রামের অবাধ প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র দেখে দেখে তিনি বড় হয়েছেন। তিনি তাঁর জন্মভূমি যবগ্রামের প্রকৃতির বর্ণনা ও তাঁর ছেলেবেলার কথা লিখেছেন এভাবেই :

'বোশেখ মাসের কোনো কোনো দিন বেলা থাকতেই ঈশেন কোণে একটুখানি কালো মেঘ সর সর করে এগোতে এগোতে আর দ্যাখ্ দ্যাখ্ করে বড় হতে হতে নিমিষে সারা আকাশে ভরে ফেলে। একেবারে দিনে দিনেই রাত নেমে আসে আর থমকে থেমে যায় সবকিছু। প্রকৃতি আর নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, আটকে রেখেছে নিজের ভেতরে। তার পরেই একেবারে প্রলয়-ঝড়। বড় বড় গাছগুলো উপড়ে, খড়ের চাল, টিনের চাল উড়িয়ে পুকুরে উথাল-পাথাল ঢেউ তুলে সব লন্ডভন্ড ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার! কতক্ষণই বা চলে কালবৈশাখী, দশ-পনেরো মিনিট? থামলেই মনে হয়, যাক, এবারের মতো প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল দুনিয়া। তারপরে ঝিরঝির করে ময়দা-চালা মোলায়েম বৃষ্টি, মেঘের তালায় সূয্যি, বেলা এখনো খানিকটা আছে। লাল আলো ছড়িয়ে হাসতে হাসতে ডুবছে সূয্যি।'

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশুনা নিজের গ্রামেই করেছেন তিনি। ১৯৫৪ সালে যবগ্রাম মহারানী কাশীশ্বরী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। যে পরিবারে হাসানের জন্ম সেই পরিবারের কেউ কেউ চাকরিতে প্রবেশ করলেও তাঁদের পারিবারিক অর্থনীতির শেকড় তখনও কৃষিতেই আমূল প্রোথিত ছিল। ১৯৫৬ সালে খুলনার দৌলতপুরের ব্রজলাল কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। প্রথম যৌবনেই ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন হাসান আজিজুল হক। রাজনীতি করার কারণেই পাকিস্তান সরকারের চরম নির্যাতন ভোগ করতে হয় তাঁকে । কলেজের অধ্যক্ষ তাঁর মেধা-বৃত্তি ফাইলচাপা করে রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। পরে তিনি এসে ভর্তি হন রাজশাহী সরকারি কলেজে। ১৯৫৮ সালে এই কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ভর্তি হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি।

১৯৫৮ সালে শামসুননাহারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর তিন মেয়ে ও এক ছেলে।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি রাজশাহী সিটি কলেজ, সিরাজগঞ্জ কলেজ, খুলনা গার্লস কলেজ এবং দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য খান সারওয়ার মুরশিদ নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে রাজশাহী নিয়ে আসেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন হাসান আজিজুল হক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ সাল পর্যন্ত টানা ৩১ বছর অধ্যাপনা করেন তিনি।

রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় একই কলেজের উদ্যমী তরুণ মিসবাহুল আজীমের সম্পাদনায় প্রকাশিত ভাঁজপত্র 'চারপাতা'য় হাসানের প্রথম লেখা ছাপা হয়। সেটি কিন্তু কোনো গল্প ছিল না। যাযাবর, সৈয়দ মুজতবা আলী ও রঞ্জনের সুবাদে রম্যরচনা তখন বেশ জনপ্রিয়। রাজশাহীর আমের মাহাত্ম্য নিয়েই প্রথম লেখাটি লিখেছিলেন তিনি। 'চারপাতা'র ছোট্ট এক কলামে ছাপা হয়েছিল হাসান আজিজুল হকের সেই রম্যরচনাটি।

খুলনায় এসে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উৎসমুখ খুলে গেল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'সন্দীপন'-কে কেন্দ্র করে। ষাটের দশকের প্রথম দিকেই নাজিম মাহমুদ, মুস্তাফিজুর রহমান, জহরলাল রায়, সাধন সরকার, খালেদ রশীদ প্রমুখ সংগ্রামী কয়েকজন তরুণের চেষ্টায় গঠিত হয়েছিল 'সন্দীপন গোষ্ঠী'। গণসঙ্গীত ও গণসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে গোটা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা। পরে ১৯৭৩ সালের দিকে তাঁদেরই কেউ কেউ, বিশেষ করে নাজিম মাহমুদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নাটক, আবৃত্তি, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা দিয়ে সরগরম করে তোলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। ততদিনে অবশ্য হাসান আজিজুল হক রীতিমতো বিখ্যাত। আদমজী এবং বাংলা একাডেমী পুরস্কারের মুকুট তাঁর মাথায়। আঙ্গিক, ভাষা ও বিষয়ের অভিনবত্বে তিনি বাংলা গল্পে তাঁর অবস্থান সংহত করে নিয়েছেন। 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'জীবন ঘষে আগুন' এইসব গ্রন্থের গল্পগুলো লিখে মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন বোদ্ধা পাঠকদের। ষাটের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের বাঁক বদলের রূপকারদের অন্যতম একজন হিসেবে স্বীকৃতিও মিলতে শুরু করেছে তাঁর।

কিন্তু কোনো স্বীকৃতিই জাত লেখককে তৃপ্ত করতে পারে না, তাঁর কলমকে বাঁধা বৃত্তের অচলায়তনে আটকে রাখতে পারে না। আর তাই হাসান আজিজুল হকও কথাসাহিত্যের প্রচলিত ধারাকেতো বটেই, নিজের লেখাকেও বার বার নতুন পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়েছেন। সময়ের সাথে যেমন সমাজের সদর-অন্দর, সমাজের মানুষের ভিতর-বাহির পাল্টেছে, তেমনি পাল্টেছে তাঁর গল্পও।

প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য'- এর প্রথম গল্প 'শকুন'- এ সুদখোর মহাজন তথা গ্রামের সমাজের তলদেশ উন্মোচিত করেছিলেন তিনি। সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় তাঁর গল্পের ভিতর-বাহির কিভাবে পাল্টেছে, প্রথম গ্রন্থের প্রথম গল্পের সাথে এ যাবৎ প্রকাশিত শেষগ্রন্থের শেষ গল্পটি পাশাপাশি রেখে পড়লেই পাঠক তা ধরতে পারবেন। সময়, সমাজ ও মানুষের অন্তর-বাহির ও বিস্তৃতি চষে বেড়িয়েছেন হাসান আজিজুল হক। প্রখর দৃষ্টি দিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন মানুষের গহীন তল্লাট।

সময় ও সমাজ আলাদা হলেও যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সময়েও মানুষ মানুষই থাকে, সেসব বৈশিষ্ট্যের দিক তুলে ধরে তাঁর গল্প বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন আবেদন নিয়ে এসেছে। যেমন 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের সেই উদ্বাস্তু লোকটি- যে তার মেয়ের মাংস বিক্রির টাকায় জীবনাতিপাত করে। তার সেই উদ্বাস্তু জীবনের গ্লানি ও বেদনাবোধ স্থান ও কালের পরিসর ছাড়িয়ে ওঠে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর গল্পচর্চায় বিষয়, চরিত্র ও নির্মাণকুশলতায় উল্লেখ করার মতো গল্প হাসান আজিজুল হকের অনেক।

তাঁর একটি গল্পগ্রন্থের নাম 'রাঢ়বঙ্গের গল্প'। শুধু এ গ্রন্থের গল্পগুলোই নয়, তাঁর অনেক গল্পেরই শিকড় আছে রাঢ়বঙ্গে। তবু আজ তিনি এই বাংলাদেশেরই লেখক। নিজেকে আমূল প্রোথিত করে নিয়েছেন এই বাংলাদেশের বাস্তবতায়।

হাসান আজিজুল হকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে: গল্পগ্রন্থ- 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' (১৯৬৪), 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' (১৯৬৭), 'জীবন ঘষে আগুন' (১৯৭৩), 'নামহীন গোত্রহীন' (১৯৭৫), 'পাতালে হাসপাতালে' (১৯৮১), 'আমরা অপেক্ষা করছি' (১৯৮৮), 'রোদে যাবো' (১৯৯৫), 'মা মেয়ের সংসার' (১৯৯৭), 'বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প' (২০০৭), 'রাঢ়বঙ্গের গল্প' (১৯৯১), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৭), 'হাসান আজিজুল হকের শ্রেষ্ঠগল্প' (১৯৯৫)। উপন্যাস- 'বৃত্তায়ন' (১৯৯১), 'আগুনপাখি' (২০০৬), 'শিউলি'। নাটক- 'চন্দর কোথায়' (জর্জ শেহাদের নাটকের ভাষান্তর) প্রবন্ধ- 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি', 'একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা', 'কথাসাহিত্যের কথকতা', 'অপ্রকাশের ভার', 'অতলের আধি', 'সক্রেটিস', 'কথা লেখা কথা', 'লোকযাত্রা অআধুনিকতা সংস্কৃতি'। শিশুসাহিত্য- 'লালঘোড়া আমি' (১৯৮৪ সালে প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস), 'ফুটবল থেকে সাবধান' (১৯৯৮ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গল্প)। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন থেকে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'হাসান আজিজুল হকের রচনাসংগ্রহ'।

তিনি ১৯৬৭ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আরও অনেক পুরস্কার, পদক ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), অগ্রণী ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৮), কাজী মাহবুব উল্লাহ ও বেগম জেবুন্নিসা পুরস্কার। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পদক একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন হাসান আজিজুল হক। 'আগুনপাখি' উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন।

দীর্ঘ ৩১ বছর অধ্যাপনার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে নিজ বাড়ি 'উজান'- এ প্রতিদিনের সবটুকু সময় লেখালেখি নিয়ে বিমগ্ন আছেন তিনি।

তথ্যসূত্র

এ লেখাটির জন্য হাসান আজিজুল হক সংক্রান্ত সনৎ কুমার সাহা, যতীন সরকার এবং জাহানারা নওশিনের রচনা, মনু ইসলাম সম্পাদিত 'সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার' প্রকাশিত 'কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক সংবর্ধনা' শীর্ষক পুস্তিকা এবং 'বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান' এবং প্রথম আলো ঈদ সংখ্যা, ২০০৮ থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

লেখক: ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ
পুনর্লিখন: গুণীজন দল

সম্পাদক : উর্মি লোহানী, প্রকাশক : গুণীজন ট্রাস্ট, মুদ্রণ : পাথওয়ে, অলংকরণ : মো. শাহজাহান কাজী, যোগাযোগ : ৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক- বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েব : www.gunijan.org.bd, ফোন : +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০২৮১৪৬৫২৪৯৬-৭

গুণীজন

আমাদের প্রেরণার উৎস

www.gunijan.org.bd

৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৪ www.gunijan.org.bd

সম্পাদকীয়

'গুণীজন' ২০০৩ সাল থেকে দেশের গুণী ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য ওয়েবসাইট (www.gunijan.org.bd), স্কুল কর্মসূচি, সিডি প্রকাশনা ও প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। নতুন প্রজন্ম তাদের দেশের সেরা সন্তানদের চিনে নিতে শিখবে–এটাও গুণীজন ট্রাস্টের একটি উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, তাঁদের অবদান, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্রের সমন্বয় করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখন অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সেটাও কাজে লাগানো হচ্ছে। গুণীজন ট্রাস্টের আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিতরণ করার জন্য ২০০৯ সাল থেকে 'গুণীজন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের সংখ্যায় চারজন সাহিত্যিকের জীবনী থাকছে। তাঁরা হলেন– সৈয়দ শামসুল হক, আনিসুজ্জামান, সুকুমার বড়ুয়া ও হাসান আজিজুল হক।

ব্র্যাক ব্যাংক আমাদের এবারের সংখ্যাটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছে। গুণীজন ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের এই উদ্যোগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সব ধরনের সহযোগিতার জন্য ডিনেটকেও ধন্যবাদ।

আমাদের এই প্রয়াস স্বার্থক হয়ে উঠবে তখনই, যখন তরুণ প্রজন্ম তাঁদের পূর্বসূরীদের সৃজনশীলতার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তাতে তাদের নিজেদের চলার পথ নির্ধারণ করা সহজ হয়ে উঠবে।

সৈয়দ শামসুল হক

বাবা বলতেন জন্মের পর ছ'মাস বয়স থেকেই এ ছেলের লেখা বা অক্ষরের প্রতি আকর্ষণ ছিল, কোন লেখা বা কোন অক্ষর দেখলে টেনে নিয়ে ককক বা ললল বলে উঠতো। বাবা সৈয়দ সিদ্দিক হোসাইন ভোর ৪টায় উঠে শোবার ঘরের টেবিলে লিখতে বসতেন। টিনের চালে শিশির পড়ার টুপটাপ আওয়াজ হত, তিনি আধো-ঘুম আধো-জাগরণে দেখতেন শান্ত-স্নিগ্ধ আর নিরিবিলি পরিবেশে বাবা তন্ময় হয়ে লিখছেন। তখন থেকেই তিনি ভাবতেন, 'লেখালেখি করাটা আসলে একটা খুব বড় কাজ আর আমিও এভাবে লেখলেখি করতে চাই।' ১৫ বছর বয়সে কবিকে গর্ভে নিয়ে তাঁর মা জীবনে প্রথম অক্ষরজ্ঞান গ্রহণ করেন। জন্মের পর একটু বড় হয়ে তাঁরা মায়ে-ছেলেতে মিলে একটি কেরোসিনের বাতি জ্বেলে তার নিচে বসে পড়াশুনা করতেন। কুড়িগ্রাম জেলায় ১৯৩৫ সালের এক শীতের রাতে সাত মাস না পেরোতেই তাঁর জন্ম হয়। খুব ক্ষীণ ছিলেন, ফলে মুখে খাবার দেয়া হত তুলোয় ভিজিয়ে। সে ক্ষীণ শিশুটিই বাংলাদেশের সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। ছোটবেলায় তাঁর বাবার লেখালেখি আর মায়ের সাথে কেরসিনের বাতির নীচে বসে লেখাপড়া এই দু'টো স্মৃতি মানসপটে গেঁথে রয়েছে খুব পরিষ্কারভাবে, কবি মনে করেন এদু'টো ঘটনাই তাঁর মধ্যে লেখা-পড়ার দিকে ঝোঁক তৈরী করেছিল, তাঁকে পড়ুয়া স্বভাবের করে দিয়েছিল, যার ফলে তিনি হয়তো আজ লেখক হতে পেরেছেন। জন্মের পর হাইস্কুল পর্যন্ত কুড়িগ্রামেই কেটেছে। তাই তাঁর প্রায় সব গল্প-উপন্যাসের প্রধান পটভূমি হল কুড়িগ্রাম জেলার জলেশ্বরী নামের এলাকা। মানসপটের কল্পনা আর বাস্তবকে মিলিয়ে এ স্থানটি তৈরী করেছেন। বাবার হাতে লেখাপড়ার প্রথম হাতেখড়ি হলেও কুড়িগ্রাম মাইনর ইংলিশ স্কুলে ক্লাস থ্রী থেকে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সূচনা ঘটে। এরপর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে কুড়িগ্রামের পাট চুকিয়ে দেন, সময়টা ছিল ১৯৪৮ দেশভাগের পরের বছর, বাবা বললেন বড় হতে হলে বড় জায়গায় যেতে হবে। পূর্ববঙ্গের নতুন রাজধানী ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে ১২ বছর বয়সে শামসুল হককে তাঁর বাবা অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেন এবং সেখান থেকেই তিনি মেট্রিক পাশ করেন।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় থেকেই তাঁর বই পড়ার ভীষণ ঝোঁক ছিল। ১৬ বছর বয়স থেকে নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন। তিনি গল্প, কবিতা পাশাপাশি লিখে গেছেন। ছেলে বড় হয়ে ডাক্তার হবে এমন আশা করলেও ছেলের কিন্তু বরাবর সাহিত্য পড়ার শখ, সে ইচ্ছা বাবার কাছে ব্যক্তও করা হল। প্রত্যুত্তরে বাবা বললেন, 'আইএসসিতে বিজ্ঞানের কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়তে ভয় পাচ্ছো বলেই তুমি ডাক্তারি পড়তে চাইছো না।' এ কথায় কিশোর শামসুল হকের আঁতে ঘা লাগলো। বাবার এই কথাটা ভুল প্রমাণ করার জন্য, এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ফলে তিনি আইএসসিতে টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত পড়লেন এবং তখন জগন্নাথ কলেজের ১১'শ ছাত্রের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়ে তিনি বাবাকে বলেছিলেন, 'আমি যে বিজ্ঞান ভয় পাই না এবং আমি বিজ্ঞান পারি এটা প্রমাণ করার জন্য আমি এতদিন বিজ্ঞানে পড়েছি। তবে আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতে চাই না। এখন আমি আর্টস পড়তে চাই।' পরের বছর তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে মানবিক শাখায় আইএ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স পড়া শুরু করেন। তবে অনার্স শেষ করার আর সুযোগ হয়নি। তার আগেই বাবার মৃত্যু হয়, ফলে পড়ালেখা ছেড়ে জীবন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। সময়টা ১৯৫৪, আট ভাই-বোনের সংসারের সকল দায়িত্ব বর্তেছিল সদ্য ১৮'য় পা দেয়া বড় ছেলে সৈয়দ শামসুল হকের ওপর। একই বছর তাঁর প্রথম গল্পের বইটি ছাপা হয়। প্রথম কবিতার বই ছাপা হয় ১৯৬১ সালে।

লেখক সৈয়দ শামসুল হক মনে করেন, স্কুল ও কলেজ জীবনে কিছু অসাধারণ শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। যাঁরা কিনা তাঁর মধ্যে ইংরেজী ও বাংলা দু'টো ভাষার খুব শক্ত ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। যা পরবর্তিতে লেখালেখি ও পেশাগত জীবনে খুব সহায়ক হয়েছিল। ফলে কবি তাঁর শিক্ষক হিসেবে দৌলতুজ্জামান স্যার, ফরিদ মাস্টার, অনীবাবু, নৃপেনবাবু, থিতিনবাবু, রাজেশবাবু, সুকুমারবাবু, অজিতকুমার গুহ, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাবেক তত্তাবধায়ক সরকার প্রধান হাবিবুর রহমান শেলী'র মত কিছু নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চান।

তিনি আরও মনে করেন তাঁর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে বুদ্ধির বিকাশ এবং চিন্তা করার শক্তি বিকশিত হয়েছিল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে। যে এলাকায় তিনি বড় হয়েছেন সেখানে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে বসবাস করতো। মুসলিম ঘরের সন্তান হিসেবে তাঁর মনে গেঁথে দেয়া হয়েছে মুসলিম কৃষ্টি, আচার-বিধান, সাহিত্য-কলা ও কোরানের বানী। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে বেদ-মহাভারত, পূজা-অর্চনা ও বিভিন্ন পার্বণ-উৎসবের সাথে পরিচিতি হতে পেরেছেন। একই সাথে তাঁর বাবার ইচ্ছাতে ছোটবেলায় প্রতি রবিবারে পাড়ার গীর্জায় বাইবেল পাঠের আসরে যেতেন। আর সে সময়ে বৃটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশে সব জায়গায় একটা পাশ্চাত্যের ভাবধারা নিহিত ছিল, স্কুলে ইংরেজী সাহিত্য পড়ানো হত বাধ্যতামূলকভাবে। ফলে এরকম পরিবেশের কারণে তাঁর মধ্যে সনাতনী ধারার মধ্য থেকে মুক্ত চিন্তা ও সঠিক যুক্তিক্রম দিয়ে ভাবার শক্তি তৈরী হয়েছিল যা তাকে লেখক হতে সহায়তা করেছে।

কবি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কথাগুলোকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন, চারিদিকের বাস্তবতাকে অনবরত পর্যবেক্ষণ করেন যার প্রেক্ষিতে মনের মধ্যে অনেক কথা তৈরী হয় এবং সেই কথাগুলোকে তিনি কখনও গল্প কখনও কবিতা বা প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তিনি লেখেন নিজের আনন্দে, মূলত নিজের মনের অস্থিরতাকে দূর করার জন্য। এরপর তা আরও দশজনের মধ্যে ভাগভাগি করে নেয়ার জন্য সে লেখাগুলোকে কাগজে প্রকাশ করেন। তবে এ পর্যন্ত তিনি আসলে কত লিখেছেন তার সঠিক হিসেব করে দেখেননি।

তথ্যসূত্র : ২০১৩ সালে নেওয়া সৈয়দ শামসুল হকের সাক্ষাৎকার।

লেখক : শামসুন নাহার রূপা

সহযোগিতায়:
BRAC BANK

আনিসুজ্জামান

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি। পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রধান অতিথি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন যখন ঘোষণা করলেন, 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' তখনই এর প্রতিবাদে আন্দোলনের ঝড় তুমুল বেগে বয়ে যেতে লাগল। যদিও ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত জিন্নাহর ভাষণের পর থেকেই আবহাওয়া উত্তপ্ত হচ্ছিল। এবার রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে উত্তাল হয়ে পড়ল দেশের ছাত্র সমাজ। ওই বছরের জানুয়ারিতেই গঠিত হলো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ঠিক হলো ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে একটা পুস্তিকা বের করা হবে। দায়িত্ব দেওয়া হলো সে-সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিপ্লবী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার ওপর। কিন্তু তিনি সময়াভাবে লেখাটা তৈরি করতে পারছিলেন না।

তখন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে তা লেখার দায়িত্ব দেওয়া হলো মাত্র ১৫ বছর বয়সের এক কিশোরকে। সবে ম্যাট্রিক পাস করে জগন্নাথ কলেজে আই.এ. প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে সে। ঠাটারিবাজারে তাঁদের বাড়ির কাছে যোগীনগরে যুবলীগের অফিস। যুবলীগের সম্পাদক অলি আহাদের কাছ থেকে পুস্তিকা লেখার প্রস্তাব পেয়ে সেতো অবাক! ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সে কী জানে আর কী-ই বা লিখবে? অলি আহাদ তাকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার মনে যা আসে, তাই লিখবেন, পরে আমি দেখব। শেষ পর্যন্ত ১৫ বছরের কিশোরই ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বিষয়ে প্রথম পুস্তিকাটি রচনা করলেন। পুস্তিকাটির নাম দেওয়া হলো 'রাষ্ট্রভাষা কী ও কেন?' আর সেদিনের ওই কিশোর-লেখকই পরবর্তীকালে আজকের বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, লেখক, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির আগে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ওপর এটাই ছিল প্রথম পুস্তিকা।

আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা এটিএম মোয়াজ্জম, পেশায় ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, সামান্য লেখালেখিও করতেন। মা সৈয়দা খাতুন, গৃহিনী হলেও লেখালেখির অভ্যাস ছিল। পিতামহ লেখক ও সাংবাদিক শেখ আবদুর রহিম ১৮৮৮ সালেই হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী লিখেছিলেন যা ছিল কোনো বাঙালি মুসলমানের লেখা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম জীবনী। আনিসুজ্জামানরা ছিলেন পাঁচ ভাই-বোন। বড় এক বোনও নিয়মিত কবিতা লিখতেন। বলা যায়, শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ছিল তাঁদের পরিবার। তাঁর রক্তের ভেতর শিল্প-সংস্কৃতির ঢেউ যে খেলা করবে তাতো স্বাভাবিকই।

কলকাতার পার্ক সার্কাস হাইস্কুলে শিক্ষাজীবনের শুরু করেন আনিসুজ্জামান। ওখানে পড়েছেন তৃতীয় শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। পরে এদেশে চলে আসার পর অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন খুলনা জেলা স্কুলে। একবছর পর ঢাকায় ভর্তি হন

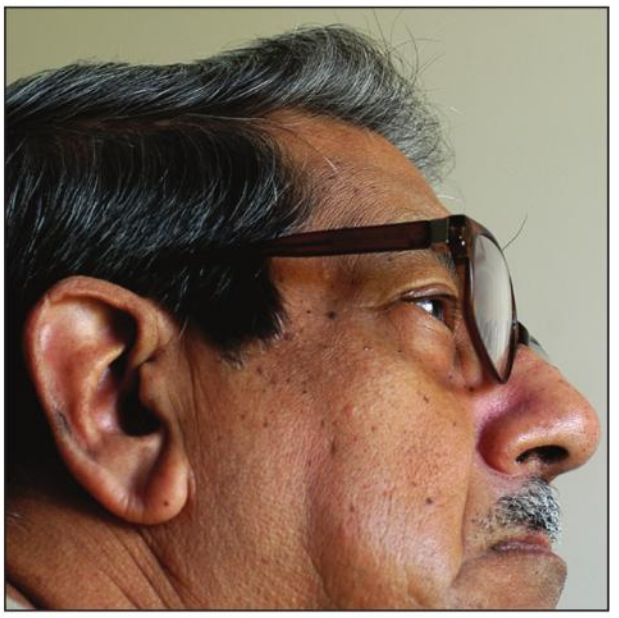

প্রিয়নাথ হাইস্কুলে। আনিসুজ্জামান ছিলেন প্রিয়নাথ স্কুলের শেষ ব্যাচ। কারণ তাঁদের ব্যাচের পরেই ওই স্কুলটি সরকারি হয়ে যায় এবং এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল। সেখান থেকে ১৯৫১ সালে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি হন জগন্নাথ কলেজে। এই কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে আই.এ. পাস করে বাংলায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনার্স শেষবর্ষের ছাত্রাবস্থায় একদিন বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি পাস করে কী করবে?' তিনি জবাব দিলেন, আমি শিক্ষকতা করতে চাই। তখন মুহম্মদ আব্দুল হাই তাঁকে শিক্ষকতার আগে গবেষণায় উৎসাহিত করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি অনার্স পাস করলেন এবং ১৯৫৭ সালে এম.এ. পাস করার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমীর প্রথম গবেষণা বৃত্তি পেলেন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক শূন্যতায় বাংলা একাডেমীর বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

বাংলা একাডেমীর বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে আনিসুজ্জামান যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর। অ্যাডহক ভিত্তিতে চাকরি হলো তিন মাসের। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা বৃত্তি পেলেন। এর কয়েক মাস পর অক্টোবর মাসে আবার যোগ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায়। ১৯৬২ সালে তাঁর পিএইচডি হয়ে গেল। তাঁর পিএইচডির অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)'। ১৯৬৪ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন ডক্টরাল ফেলো হিসেবে বৃত্তি পেয়ে।

১৯৬১ সালের রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৬৭ সালে তথ্যমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে বলেন, রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানের জাতীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস করতে বলা হয়েছে। এটা ছিল প্রকারান্তরে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করার একটা পাঁয়তারা। এর প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বিবৃতিতে আনিসুজ্জামান স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন এবং সেটা বিভিন্ন কাগজে ছাপতে দিয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলন-সংগ্রামে তিনিও পুরোপুরি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর শামসুজ্জোহা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাতে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঘাতকদের বিচারের দাবিতে অবিরাম ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন আনিসুজ্জামান।

৩ জুন ভোরবেলায় গাড়ি চালিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন আনিসুজ্জামান। সঙ্গে দুই সঙ্গী- ভূঁইয়া ইকবাল ও আব্দুল মান্নান ওরফে মইনু। দাউদকান্দি আর চান্দিনার মাঝামাঝি জায়গায় তাঁদের গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটলো। রাস্তা থেকে গাড়িসহ ছিটকে পড়ে গেলেন নিচের ক্ষেতে, গাড়ির চার চাকা তখন আকাশমুখো, আর ভেতরে কুজো হয়ে পড়ে আছেন তিনজন। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে কুমিল্লার সিএমএইচে নিয়ে গেলেন কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ- তিনি তখন কুমিল্লার পিএসডি। দুর্ঘটনায় সঙ্গীদের তেমন কিছু না হলেও আনিসুজ্জামান গুরুতর আহত হয়েছিলেন। কয়েকদিন কুমিল্লায় চিকিৎসা নিয়ে চলে আসেন ঢাকায়। ওই সময় বেশ কিছুদিন অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিলেন তিনি।

ওই সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান জানান, "নীলক্ষেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় আমাকে একদিন দেখতে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ, সঙ্গে বোধহয় আব্দুল মমিনও ছিলেন। আমার ধারণা, তাজউদ্দীনই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু চলে যাওয়ার ঠিক আগে আমার পাঁচ বছরের মেয়ে রুচি এসে আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, 'আসাদ আসেনি?' আসলে গণঅভ্যুত্থানের সময়ে পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও দু'টো শ্লোগান মুখস্থ করে ফেলেছিল: 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো' আর 'আসাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না'। তাদের কাছে মুজিব ও আসাদ খুব কাছের মানুষ। তাই শেখ মুজিব এসেছেন শুনে রুচি আর তার বন্ধুদের মনে হয়েছিল, তবেতো তাঁর সঙ্গে আসাদেরও আসার কথা। রুচিকে কানে কানে কথা বলতে দেখে বঙ্গবন্ধু আমার কাছে জানতে চাইলেন, সে কী বলছে। আমার জবাব শুনে সেই বিশালদেহী মানুষটি নিচু হয়ে রুচির গাল ধরে বললেন, 'ওরা আমার কাছে এই কৈফিয়তেতো চাইতেই পারে।' আমি যেন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। রুচির মাথায় হাত দিয়ে বঙ্গবন্ধু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।" ('আমার একাত্তর')

প্রায় মাসখানেক বিশ্রামের পর ১৯৬৯ সালের ৩০ জুন ঢাকা থেকে সপরিবারে বিমানযোগে চট্টগ্রামে পৌঁছেন এবং ঐদিনই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের রিডার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই অবস্থান করেছিলেন। তারপর চলে গেলেন কুলেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলে। পরে ভারতে গিয়ে প্রথমে শরণার্থী শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন। জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বক্তৃতা লেখার কাজে যুক্ত ছিলেন। কখনও তিনি আগে বাংলা বক্তৃতা লিখতেন এবং সেটির ইংরেজি অনুবাদ করতেন খান সরওয়ার মুরশিদ, আবার কখনও মুরশিদ সাহেব আগে ইংরেজি ভাষ্য তৈরি করতেন, পরে সেটির বাংলাটা করতেন আনিসুজ্জামান। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, তেমনি এদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে একজন নির্ভীক সৈনিক হিসেবে অবদান রেখেছেন ড. আনিসুজ্জামান।

১৯৭৪-৭৫ সালে কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমি স্টাফ ফেলো হিসেবে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে গবেষণা করেন। জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-প্রকল্পে অংশ নেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত। ১৯৮৫ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ প্রায় ২০ বছরের মতো শিক্ষকতার পর অবসর নেন ২০০৩ সালে। কিন্তু ২০০৫ সালে আবার সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে দুই বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ (কলকাতা), প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ ক্যারোলাইন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন।

আনিসুজ্জামান অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন বটে কিন্তু প্রকৃত নেশা তাঁর লেখালেখি ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বহু বাংলা ও ইংরেজি বই রয়েছে। যেগুলো আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিবেচনায় খুবই গুরুত্ববহ। তাঁর প্রবন্ধ-গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে- মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, মুনীর চৌধুরী, স্বরূপের সন্ধানে, Social Aspects of Endogenous Intellectual Creativity, Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Official Library and Records, আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পুরোনো বাংলা গদ্য, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, Creativity, Reality and Identity, Cultural Pluralism, Identity, Religion and Recent History , আমার একাত্তর, মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর, আমার চোখে, বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে, পূর্বগামী, কাল নিরবধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বেশকিছু উল্লেখযোগ্য বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদও করেছেন। এর মধ্যে- অস্কার ওয়াইল্ডের An Ideal Husband-এর বাংলা নাট্যরূপ 'আদর্শ স্বামী', আলেক্সেই আরবুজুভের An Old World Comedy-র বাংলা নাট্যরূপ 'পুরনো পালা' (১৯৮৮)। এছাড়াও অসংখ্য গ্রন্থ একক ও যৌথ সম্পাদনা করেছেন তিনি। এর মধ্যে- রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর-রচনা সংগ্রহ (যৌথ), Culture and Thought (যৌথ), মুনীর চৌধুরী রচনাবলী ১-৪ খণ্ড, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (যৌথ), অজিত গুহ স্মারকগ্রন্থ, স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থ, নজরুল রচনাবলী ১-৪ খণ্ড (যৌথ), SAARC : A People's Perspective, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচনাবলী (১ ও ৩ খণ্ড), নারীর কথা (যৌথ), ফতোয়া (যৌথ), মধুদা (যৌথ), আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী (১ম খণ্ড, যৌথ), ওগুস্তে ওসাঁর বাংলা-ফরাসি শব্দসংগ্রহ (যৌথ), আইন-শব্দকোষ (যৌথ) উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে, সাংগঠনিকক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন আনিসুজ্জামান। তাঁরই ফলস্বরূপ পেয়েছেন বেশকিছু পুরস্কার ও সম্মাননা। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে- নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬), স্ট্যানলি ম্যারন রচনা পুরস্কার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৮), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০), অলক্ত পুরস্কার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৫), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৬), বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার (১৯৯০), দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা স্মৃতিপদক (১৯৯৩), অশোককুমার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪)। সম্মাননার মধ্যে- রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি. লিট (২০০৫)। তিনি বেশকিছু উল্লেখযোগ্য স্মারক বক্তৃতা করেছেন। এগুলোর মধ্যে- এশিয়াটিক সোসাইটিতে (কলকাতা) ইন্দিরাগান্ধী স্মারক বক্তৃতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা, নেতাজী ইন্সস্টিটিউট অফ এশিয়ান অ্যাফেয়ার্সে নেতাজী স্মারক বক্তৃতা এবং অনুষ্টুপের উদ্যোগে সমর সেন স্মারক বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে তিনি শিল্পকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'যামিনী' এবং বাংলা মাসিকপত্র 'কালি ও কলম'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি নজরুল ইন্সস্টিটিউট ও বাংলা একাডেমীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক কাগজ ও লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়মিতই ছাপা হচ্ছে।

জীবনসঙ্গিনী সিদ্দিকা জামানের সঙ্গে আনিসুজ্জামানের প্রথমে প্রেম এবং তারপর বিয়ে। তাঁরা বিয়ে করেন ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে। আনিসুজ্জামান ও সিদ্দিকা জামান দম্পতির দুই মেয়ে, এক ছেলে।

শৈশব থেকেই জীবনের নানারকম বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে জীবনকে দেখেছেন তিনি গভীর অতলস্পর্শীরূপে। মাত্র দশ বছর বয়সেই দেশভাগের ফলে জন্মভূমি ছেড়ে দেশান্তরী হতে হয়েছে তাঁকে। তিনি দেখেছেন বিভিন্ন ধরনের বাস্তবতা, বিভিন্ন ধরনের মানুষ, বিভিন্ন ধরনের জীবন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রঅস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত এরকম প্রায় প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সাক্ষীই শুধু তিনি নন, সক্রিয় অংশগ্রহণও করেছেন। জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছেন। লেখালেখির মাধ্যমে নিজের চিন্তা, দর্শন ও সৃজনশীলতাকে অব্যাহত রেখেছেন এখনও।

(তথ্যসহযোগিতা নেওয়া হয়েছে- আমার একাত্তর, লেখক- আনিসুজ্জামান, ১৯৯৭; কালনিরবধি, লেখক- আনিসুজ্জামান, ২০০৩, লেখক অভিধান, বাংলা একাডেমী, ২০০৮)

মূল লেখক : সৌমিত্র দেব
পুনর্লিখন : সফেদ ফরাজী

সহযোগিতায়: BRAC BANK

সুকুমার বড়ুয়া

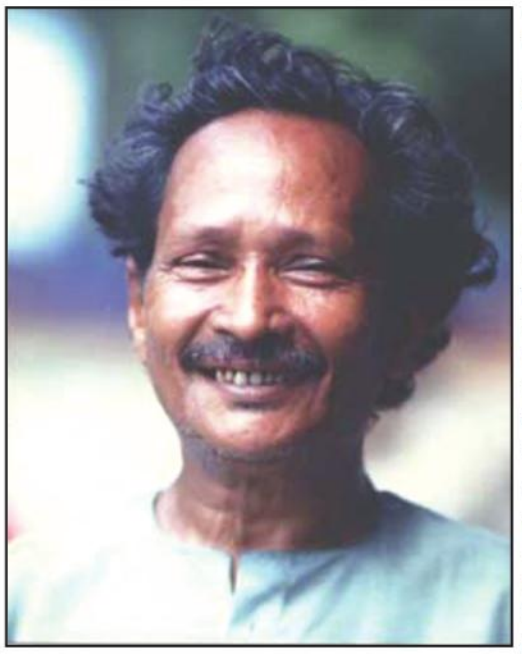

১৯৫৭ সালের দিকে চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ নালাপাড়ার একটা মেসে কাজ নিলেন সুকুমার বড়ুয়া। পাঁচ জনের জন্য রান্না করতে হত তাঁকে। খাওয়াসহ মাসে ১৫ টাকা বেতন। সকালে তাঁর রান্না শেষ হওয়ার পর সবাই খেয়ে যখন বাইরে কাজে চলে যেতেন তখন সুকুমার বই পড়ার নেশায় মেতে ওঠেন। 'সঞ্চয়িতা', 'সঞ্চিতা', 'পথের পাঁচালী', 'কুলি', 'জনান্তিক' আরও সব শিহরণ জাগানো বই। এই বইগুলি, এর ভেতরকার জগৎ, সুকুমারের ভেতরটাকে এবং তাঁর জীবনের অর্থটাকে বদলে দিচ্ছিল সঙ্গোপনে।

এই মেসে কাজ করার সময় নিয়মিত চায়ের দোকানে যেতেন তিনি। সেখানে যাওয়ার একমাত্র আকর্ষণ ছিল 'খেলাঘর' আর 'কচি কাঁচার আসর' পড়া। এই প্রচুর পড়াই একদিন তাঁকে সাহস জোগালো। লিখতে বললো। কেউ, কোন মানুষ কিন্তু নয়। নিভৃতে অন্যদের লেখাই তাঁকে লিখতে বলল, উৎসাহ জোগালো। তিনি লিখলেনও প্রথম কবিতা। বৃষ্টি নিয়ে। 'বৃষ্টি নেমে আয়'। প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হয় 'খেলাঘর'-এর পাতায়। সেটা ৩ জুলাই, ১৯৫৮ সাল। প্রথম লেখা প্রকাশের আনন্দকে অপার্থিব আনন্দ বলে মনে হয়েছে সুকুমার বড়ুয়ার কাছে। আর এই আনন্দের সাথে বাড়তি পাওয়া হিসেবে যোগ হয়েছে পুরস্কার। জীবনের প্রথম লেখার জন্য তিনি ৩য় পুরস্কার পান।

সেই শুরু এরপর আর থেমে থাকেনি দেশের সুপরিচিত ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়ার লেখা। শুধু ছড়ার জগতে আবদ্ধ থেকে লেখার জন্য তিনি অকল্পনীয় প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন।

সুকুমার বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার মধ্যম বিনাজুরি গ্রামে। ৫ জানুয়ারি, ১৯৩৮ সালে। পিতার নাম সর্বানন্দ বড়ুয়া। মা কিরণ বালা বড়ুয়া। বাবার একটা ছেলের শখ ছিল। সেই শখের ধারাবাহিকতায় তিনি বাবা মায়ের তেরতম সন্তান।

জন্মের পর তাঁর নাম কী রাখা হবে এ ব্যাপারে তাঁর পূজা দিদি আর বাবা সর্বানন্দ বড়ুয়া কথা বলতেন ঘুমুতে যাবার আগে। ছোট ভাইয়ের নাম কী হবে এ নিয়ে বোনটির চিন্তার অন্ত ছিল না। হিন্দু মহাভারতের অনেক পাত্র পাত্রীর নাম তাঁদের দু'জনেরই জানা ছিল। ফলে প্রতিদিনই নাম বদলে যায়। আজ অর্জুন তো কাল নকুল। তার পরদিন মহাদেব। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সেই প্রভাবে কোন কোন দিন তাঁর নাম চীন, জাপান, আমেরিকাও হয়েছে। সেই নাম অর্জুন, মহাদেব, চীন, জাপান ঘুরে সুকুমার বড়ুয়া হলো তাঁর মামা বাড়ির প্রভাবে।

তখন ১৯৪৩ সাল। দুর্ভিক্ষের বছর। সারা পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক কালো ছায়া। সুকুমার বড়ুয়ার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। বাড়িতে, পুরো পরিবারে বড় দুই বোনসহ ছয়জন সদস্য। কোন জমিজমা নেই। বাবা হাটবাজারে ছোটখাট বেচাকেনা করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল থাবায় জনজীবন বিপর্যস্ত। জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। অনাহারে অর্ধাহারে থেকে ভিখারীর সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন। পুরো পরিবারটি চলছে শুধু শাক সেদ্ধ খেয়ে। রুচি বদলের জন্য কোন কোন দিন কলার থোড় কখনোবা ভাতের মাড় খেয়ে দিন যাপন করতে হয়েছে তাঁদের। কোনো কোনো দিন তাও জুটতো না। অনেক শখের শিশুপুত্র আর বাড়িতে পাঁচ পাঁচটা মুখ। এই হাহাকার সারা পৃথিবীর মত তাঁর বাবার বুকের মধ্যেও বেজেছিল। একসময় বাবা বেরিয়ে পড়েন ভাগ্যান্বেষণে। কেউ জানলো না কোথায় গেলেন। বাবা আর ফিরে আসেননি সুকুমারদের জীবনে, পরিবারে।

সেই পূজা দিদি। যিনি বিভূতিভূষনের দূর্গার মতো ছিলেন সুকুমারের জীবনে। একদিন মধ্যম বিনাজুরির সেই দোচালার ছনের ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। সুকুমার তখন বড় দিদির বাড়ি। এর পনের বছর পর 'পথের পাঁচালী' পড়তে গিয়ে দূর্গার সাথে তাঁর পূজা দিদির মিল দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিলেন সুকুমার।

দুর্ভিক্ষের সময় অভাবের কারণে সুকুমারের মা তাঁকে মামাবড়িতে রেখে আসেন। কারণ এখানে খাওয়া দাওয়ার সুবিধা ছিল কিছুটা বেশি। মামাবাড়িতে এসে মামীমাকে খুব ভয় পেতেন সুকুমার। কারণ সে বাড়িতে শিক্ষাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো। যে বিষয়টি তাঁর নিজের বাড়িতে ছিল না। বর্ণজ্ঞান থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চরমে পৌঁছেছে।

দেশে দুর্ভিক্ষ আর হাহাকার বেড়েই চলেছে। পথে ঘাটে রোজ অনাহারে মানুষ মরছে। মামাবাড়িতেও চরম অভাব। সুকুমার মামা বাড়ি থেকে আবার মধ্যম বিনাজুরি গ্রামে ফিরে গেলেন বড়দিদির বাড়ি। মামাবাড়িতে থাকতে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি-খুশি' পুরোটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এখানে তাঁর বোন সুমতি প্রথমে হাতে লেখা বই, পরে একটি বাল্যশিক্ষা কিনে পড়তে দিয়েছিলেন। অল্প কদিনের মধ্যে বাল্য শিক্ষা পুরোটা মুখস্থ দেখে সবাইতো অবাক। অনেকেই সে সময় বলাবলি করলেন, ছেলেটার মাথা আছে।

দিদি তাঁকে ডাবুয়া খালের পাশে 'ডাবুয়া স্কুল'-এ ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু সেই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তৃতীয় শ্রেণীর পড়াটা আর শেষ হয়নি সুকুমারের। তাঁর বড় দিদি তাঁকে পরীক্ষা দিতে দেননি। পড়াননি। স্কুলে যাওয়ার সময় বাধা দিলেন। বললেন, যাও গরু ছাগল রাখো, পড়তে হবে না। প্রচুর কাজের চাপে, ব্যবহারের বস্ত্রের অভাবে যখন সুকুমারকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না, তখনই মা এসে তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। নিয়ে গেলেন চট্টগ্রাম শহরে দামপাড়া পুলিশ লাইনে মামাবাড়িতে। সেখানে তাঁর মামা পুলিশে কনষ্টেবলের চাকরি করেন। মামা, মামী, দিদিমা আর দুই বছরের সাধনের সাথে সুকুমারও এই প্রথম শহরবাসী হলেন। ওখানে তাঁর কাজ ছিল মামাতো ভাই সাধনকে নিয়ে খেলা করা আর পানি সংগ্রহ করা।

১৯৫০ সালের ১ জুন। চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ নালাপাড়ার বাবু মনোমহোন তালুকদার এর বাসা। সেখানে মাসিক তিন টাকা বেতনের চাকুরি নিলেন সুকুমার। একটি পাঁচ মাসের শিশুকে সঙ্গ দেওয়া তাঁর প্রধান কাজ। এই পরিবারে এসে জীবনে প্রথম কিছুটা উন্নত শ্রেণীর রুচিশীল মানুষের সাথে পরিচয় হলো সুকুমারের। এতোদিন যাঁদের আশে-পাশে তিনি ছিলেন, তাঁরা সকাল আর রাতের খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খেতেন। সেই জীবন থেকে শিল্প সাহিত্য অনেক দূরের বিষয় ছিল। এই বাড়িটির কর্তাবাবুটি গম্ভীর প্রকৃতির হলেও বেশ স্নেহপ্রবণ ছিলেন। গৃহকর্ত্রী মাসীমা আপন সন্তানের মতো সুকুমারকে ভালোবাসেন। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নাচ, গান, নাটক ইত্যাদি করে। সুকুমারের সাথে তাদের আপন ভাইবোনের মতো সম্পর্ক। কেউই সুকুমারকে আলাদা চোখে, কাজের ছেলে হিসাবে দেখতেন না।

১৯৫২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সুকুমার তাঁর এক মামাতো ভাইয়ের সাথে ভৈরব বাজার চলে এলেন। সেখানে বাবুর্চির কাজ নিলেন। দু'জনের জন্য রান্না করার কাজ। এখানে কাজ করার পেছনে ভিন্ন একটি উত্তেজনা কাজ করতো সুকুমারের ভেতর। কারণ এখানে এসেই পেলেন মামাতো ভাইয়ের সংগ্রহে রাখা 'দেব সাহিত্য কুটির'-এর মজার মজার শিশু সাহিত্য সংকলন। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সেইসব পড়া শুরু করতেন।

এর ছ'মাস পর চট্টগ্রামের সেই পুরোনো বাসায় আবার কাজ নিলেন এবং সেখানে তিনি আরো দু'বছর ছিলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত বেতনের অভাবে সে বাসার কাজ ছেড়ে দিয়ে এক চায়ের দোকানে কাজ নিলেন তিনি। সেখানে সাত টাকা বেতন ছিল। এই দোকানে ১৯৫৫ সালে ১০ মাস কাজ করেছিলেন তিনি।

এরপর ১৯৫৭ সালের দিকে সবকিছু ছেড়ে আবার সেই দক্ষিণ নালাপাড়ার পুরোনো বাসায় ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন সেই বাসাটা মেস হয়ে গেছে। সেই মেসে মাসে ১৫ টাকা বেতনের কাজ নিলেন সুকুমার বড়ুয়া। পাঁচ জনের জন্য রান্না করতে হয়। কিন্তু ১৫ টাকা বেতনে তাঁর আর চলছিল না। সেই কাজ ছেড়ে ১৯৫৯ সালে কিছুদিন ফলমূল বিক্রি করলেন। এরপর আইসক্রিম, বুট বাদাম ইত্যাদি বিক্রি করেও রোজগার বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। লালদিঘির পাড় থেকে শুরু করে উজারা সিনেমা হল পর্যন্ত অনেক কিছু ফেরি করে বিক্রি করে বেড়িয়েছেন সুকুমার। অবস্থাসম্পন্ন বড় বড় আত্মীয়রা দূর থেকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। অনেকে আক্ষেপও করেছেন। দানিয়ালাপাড়ায় মাসিক পাঁচ টাকায় বাসা ভাড়া করে মাকে নিয়ে এলেন তিনি। অনেকদিন পর আবার মায়ের সাথে থাকা শুরু হল। কিন্তু রোজগার আর খরচের তারতম্যের কারণে জীবন প্রায় থেমে যায় যায় করছে। মেসে থাকতে ঢাকার পত্রিকায় ছয় সাতটি লেখা বেরিয়েছিল। এখন কিন্তু লেখালেখি নিয়ে ভাবার অবকাশও নেই।

বছর খানিক এভাবে কাটলো। এরপর মাকে আবার মামা বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজে ফিরে গেলেন সেই পুরোনো মেসে। আগের বেতনেই। এখানে একটা সান্ত্বনা আছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখালেখি করার সুযোগটা পাওয়া যায়। এরমধ্যে 'দৈনিক জামানা' পত্রিকায় একটা দীর্ঘ লেখা নিয়ে গেলেন তিনি। নাম, 'পথের ধূলো'। করুণ কবিতা। কবিতাটি জসীম উদ্দীন এর 'কবর' কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা। এই কবিতাও পড়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর মেসেই।

এরমধ্যেই ঢাকায় আসার জন্য মন তৈরী হয়ে গেছে সুকুমারের। কারণ তাঁর মন বলছে, এখানে থাকলে আসলে কিছুই হবে না। কিন্তু জীবনে উপার্জন আর সুনাম দু'টোরই দরকার আছে। তাই মিথ্যে বলতে হলো তাঁকে। মেসের কর্মকর্তাদের একদিন বললেন, 'আমি এক ছাপাখানায় প্রশিক্ষণের কাজ পেয়েছি।' কবি হয়ে বাবুর্চিগিরি যেমন পোষায় না তেমনি মানায়ও না। বড় ভাইয়ের মতো স্নেহপ্রবণ সবাই সুকুমারকে মুক্তি দিতে রাজি হলেন।

মহানন্দে সাত টাকা দশ আনার টিকিট কেটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন সুকুমার বড়ুয়া। ঢাকায় এসে পেলেন দাদাভাইকে, ইত্তেফাক অফিসে। তারপরে বাবু দেবপ্রিয় বড়ুয়ার (অবসরপ্রাপ্ত বাসস প্রধান) সাথে পরিচয় হল। তোপখানা রোডে তাঁরা সাতজন মেস ভাড়া করেছেন। কাজের লোক দরকার। আবারও চাকরি মিলে গেল। মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে সাতজনের জন্য পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি। চাকরিতো হলো কিন্তু লেখা আর হয় না। তবুও অনেক কষ্ট করে লিখলেন 'ছারপোকার গান' আর 'খাওয়ার গান' শিরোনামের দুটি লেখা। ১৯৬১ সালের ২৭ ডিসেম্বর। এই বছরেই মাকে হারান সুকুমার বড়ুয়া।

১৯৬২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে চৌষট্টি টাকা বেতনের চাকুরী হয় সুকুমারের। ১৯৬৩ সালে তোপখানা রোডে ছয় টাকায় বেড়ার ঘর ভাড়া করে এই প্রথম স্বাধীনভাবে প্রচুর লেখালেখি শুরু করেন। কচিকাঁচার আসর, খেলাঘর আর মুকুলের মাহফিলে এসমস্ত লেখা ছাপা হতে থাকে। ১৯৭৪ সালে পদোন্নতি হয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী হন। ১৯৯৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টোর কিপার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬৪ সালের ২১ এপ্রিল ননী বালার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সুকুমার বড়ুয়া। সুকুমার বড়ুয়া চার সন্তানের জনক। তাঁর তিন মেয়ে ও এক ছেলে।

১৯৭০ সালে 'পাগলা ঘোড়া', ১৯৭৬ সালে 'ভিজে বেড়াল', ১৯৭৯ সালে 'চন্দনা রঞ্জনার ছড়া', ১৯৮০ সালে 'এলোপাতাড়ি', ১৯৮১ সালে 'নানা রঙের দিন', ১৯৯১ সালে 'সুকুমার বড়ুয়ার ১০১টি ছড়া', ১৯৯২ সালে 'চিচিং ফাঁক', ১৯৯৫ সালে 'কিছু না কিছু', ১৯৯৭ সালে 'প্রিয় ছড়া শতক', ১৯৯৭ সালে 'বুদ্ধ চর্চা বিষয়ক ছড়া', ২০০৬ সালে 'ঠিক আছে ঠিক আছে' গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। এছাড়া সুকুমার বড়ুয়ার আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সুকুমার বড়ুয়া তাঁর লেখালেখির জন্য বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁকে ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২ সালে ঢালী মনোয়ার স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে বৌদ্ধ একাডেমী পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ সম্মাননা, ১৯৯৭ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য সম্মাননা, ১৯৯৯ সালে আলাওল শিশু সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে চোখ সাহিত্য পুরস্কার, ভারত, ২০০৪ সালে স্বরকল্পন কবি সম্মাননা পদক, ২০০৬ সালে অবসর সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এখন তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে নিজের লেখাগুলিকে সংরক্ষণ করার চিন্তায়। তিনি আজীবন বুকের ভেতর একটি বড় স্বপ্ন লালন করছেন। সেটি চট্টগ্রামে সুকুমারের পৈতৃক ভিটায় 'সুকুমার শিশু তীর্থ' নামে একটি শিশু পাঠাগার স্থাপন করা। এই পাঠাগারটি স্থাপন করার জন্য তিনি সমাজের সকলের কাছে আবেদন জানান। বেঁচে থাকাকালীন তিনি এই পাঠাগারের কাজ শেষ করতে চান।

তথ্য সূত্র

সুকুমার বড়ুয়া, উত্তম বড়ুয়া, অরূপ রতন বড়ুয়া, রঞ্জনা বড়ুয়া, রাশেদ রউফ, নাওশেবা সবিহ্ কবিতা, চারুলতা, ভোরের কাগজের ইষ্টু কুটুম বিভাগ, টইটুম্বুর, জোবাইর হোসাইন সিকদার, স্বপন কুমার বড়ুয়া, নজরুল ইসলাম নঈম, তপন বাগচী, মাশরুফা মিশু, আলী আজম, শফিকুল আলম টিটন, সবুজের মেলা প্রমুখ।

মূল লেখক: পথিক সুমন, পুনর্লিখন : গুণীজন দল

সহযোগিতায়:
BRAC BANK